STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

মে ২০১৭
নবপর্যায় ৪৯
মূল্য ১০ টাকা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

ভাস্কর্য অপসারণ বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক পরাজয়

ঐক্য পরিষদের সংবর্ধনা সভায় আবদুল গাফফার চৌধুরী

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

অমর একুশের গানের রচয়িতা, প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবদুল গাফফার চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টের সামনে থেকে ভাস্কর্য অপসারণকে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক পরাজয় বলে অভিহিত করে বলেছেন, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমরা বিজয়ী হয়েছি। আজ এতোদূর এসে আমরা পরাজয় মেনে নিতে পারি না। আবদুল গাফফার চৌধুরী গত ২৬ মে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাজুল ইসলাম মিলনায়তনে তাঁর সম্মানে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি বলেন, শহীদ মিনারকে এক সময় দুর্গামূর্তি বলা হয়েছিল। জামায়াত বলেছিল এখানে মসজিদ বানানো হবে। সাত বার ভাঙ্গা হয় শহীদ মিনার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শহীদ মিনার বাঙালির আশা আকাংখার প্রতীক হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দুঃখ পাই যখন শুনি কিছু বুদ্ধিজীবী ভাস্কর্য সরানোর অজুহাত হিসেবে বলেছেন, এটাতে নান্দনিক ত্রুটি আছে।

ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলির সদস্য, রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক,

পৃষ্ঠা ২

Courtesy By
Prime Bank Limited
২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ডাক
নিরাপত্তাহীনতা ও অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্তি চাই
২০ মে ২০১৭ । জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী। মঞ্চে উপবিষ্ট আলোচকবৃন্দ ছবি : পরিষদ বার্তা

অর্জন কম নয়, পর্যায়ক্রমে বাধা পেরিয়ে যেতে হবে : গওহর রিজভী

আরেক মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য মুক্তিযুদ্ধ হয়নি : রানা দাশগুপ্ত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

২০ মে সারাদেশে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে এ উপলক্ষে ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বলা হয়েছে, সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম যুক্ত করতে তৎকালীন সামরিক স্বৈরশাসক

পৃষ্ঠা ২

জাতির বিবেক
সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরীকে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঐক্য পরিষদ আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখছেন অমর একুশের গানের রচয়িতা, সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবদুল গাফফার চৌধুরী। মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) পীযূষ বন্দোপাধ্যায়, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সম্বর্ধেয় অতিথি, সভার সভাপতি হিউবার্ড গোমেজ, অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক ও এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত ছবি : পরিষদ বার্তা

শ্যামল কান্তি ভক্ত যদি জঙ্গি হতেন...

অজয় দাশগুপ্ত

দৈনিক সমকাল পত্রিকা ৩১ মে একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম করেছে- জঙ্গিরা জামিনে বের হয়ে যাচ্ছে। এতে বলা হয়, মে মাসেই কাশিপুর হাইসিকিউরিটি কারাগার থেকে ১২ জন দুর্ধর্ষ জঙ্গি মুক্তি পেয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, এ সব জঙ্গি মুক্ত হওয়ায় রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা বাড়বে, এমনই আশঙ্কা। কীভাবে তারা মুক্তি পাচ্ছে, সেটা বড় প্রশ্ন। নারায়ণগঞ্জের সম্মানিত শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত যদি এমন ভয়ঙ্কর জঙ্গি হতেন, তাহলে হয়তো তাকে বিনা দোষে, মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে কাটাতে হতো না। তার বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছিল। তাকে প্রকাশ্যে ছাত্রছাত্রীদের সামনে কান ধরে ওঠবস করানো হয়েছিল। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য। তারই নির্দেশে এমন শাস্তি দেওয়া হয়। আমাদের আইনে ছাত্রছাত্রীদের কান ধরে ওঠবস করানো কিংবা এ ধরনের কঠোর শাস্তি দণ্ডনীয়।

পৃষ্ঠা ২

'সংখ্যালঘুরা এদেশে রাষ্ট্রীয় লুণ্ঠনের শিকার'

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি উঠেছে। ১৪ মে রোববার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন-এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও তার ফলাফল' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এ দাবি জানান। আগামি নির্বাচনের আগেই তারা এ আইনের বাস্তবায়ন চান। অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (এএলআরডি) উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে মূল গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত। এতে মোট ১৭ দফা সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

অধ্যাপক বারকাত তার প্রতিবেদনে বলেন, অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক পরিবারকে গড়ে প্রায় ২ লাখ ২৭ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। এ ব্যয়ের অন্তত ৫০ ভাগও যদি ঘুষের জন্য ব্যয় হয়, তাহলে এ পর্যন্ত দায়ের করা ২ লাখ মামলায় ঘুষের পরিমাণ হবে দুই হাজার ২৭০ কোটি টাকা।

নির্বাচনের আগেই অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন দাবি

ভুক্তভোগীরা চারটি শ্রেণিকে বিচারের রায়ের দীর্ঘসূত্রতার জন্য দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করেন। সেগুলো হলো, ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়, এসি ল্যান্ডের কার্যালয়, আইনজীবী ও সরকারি কৌসুলি। গবেষণার জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের ৯০ শতাংশই বলেছেন, সম্পত্তি ফিরে পেতে তারা ধারাবাহিক মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। অকারণ ব্যয়, ঋণ করা, সঞ্চয় কমে যাওয়ার ফলে এই মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হয় তাদের।

গবেষণা অনুযায়ী, ভুক্তভোগী ১০ ভাগ পরিবার সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার জন্য আইনি প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়নি। এ ছাড়া অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন এবং পরবর্তী সংশোধনীতে নাগরিক সমাজের উত্থাপিত সুপারিশগুলোর শতকরা ৭২ ভাগ সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়নি। তাই কালবিলম্ব না করে এ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করাসহ মোট ১৭টি সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

এএলআরডির সহযোগিতায় হিউম্যান রিসোর্চ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার পরিচালিত এ গবেষণায় উলেখযোগ্য সুপারিশগুলো হলো : এ আইনে হিন্দু সম্পত্তি তালিকাভুক্তকরণ দণ্ডনীয় অপরাধ এ বিষয়টি জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমে সরকারি ঘোষণা হিসেবে জানিয়ে দেওয়া, অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে সম্পদ প্রত্যর্পণের লক্ষ্যে মূল মালিক ও তার উত্তরাধিকারীদের

পৃষ্ঠা ২

'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন-এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও তার ফলাফল'
শীর্ষক
সেমিনার
১৪ মে, ২০১৭ ❖ কনফারেন্স লাউঞ্জ, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সুলতানা কামাল ছবি : পরিষদ বার্তা

'সংখ্যালঘুরা এদেশে রাষ্ট্রীয় লুণ্ঠনের শিকার'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন, সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সরকারি রক্ষণাবেক্ষণাধীন সম্পত্তি মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীদের কাছে লিজ দেওয়া, শত্রু সম্পত্তি আইনে অধিগৃহীত যা কিছু ৯৯ বছরের লিজ দেওয়া হয়েছে সেগুলো বাতিল করে মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দেওয়া, সম্পত্তি প্রত্যর্পণে ভূমিহীন ও নিঃস্ব, খানা নারী প্রধান, বসতভিটা হারানো মানুষ, অর্পিত মন্দির, প্রার্থনাস্থল, শ্মশান ঘাটসহ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া, জবরদখলকৃত বা অর্পিত সম্পত্তি চিহ্নিত করে বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য বিশেষ ক্ষতিপূরণ প্যাকেজের ব্যবস্থা করা, যেসব সম্পত্তির আইনগত দাবিদার অনুপস্থিত সেগুলো দারিদ্র্য বিমোচনে ও ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যবহার করা, আইন বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারকে সর্বোচ্চ মাত্রায় যুক্ত করা প্রভৃতি।

সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সরকার এখন ক্ষমতায় রয়েছে। অথচ বঞ্চিতরা তাদের অধিকারগুলো যথাযথভাবে ও নির্বিঘ্নে আদায় করতে পারছে না। দ্রুত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের দাবি জানান তিনি।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেন, সংখ্যালঘুরা এ দেশে রাষ্ট্রীয় লুন্ঠনের শিকার। ৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুকে ২০ শতাংশ ভোট দিয়েছিল এ দেশের সংখ্যালঘুরা। দেশ থেকে সংখ্যালঘুরা দ্রুত কমে যাচ্ছে। আগে এ দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল ২১ শতাংশ, বর্তমানে কমে এসেছে ৯ শতাংশে। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য সংখ্যালঘুদের কথা বিবেচনা করতে হবে। নির্বাচনের আগেই অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

'নিজেরা করি'র সমন্বয়ক খুশী কবির বলেন, স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও আইনের কথা বলছি, তা আমাদের জন্য লজ্জার বিষয়। কোর্টের নির্দেশ বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বনানীর ঘটনা উলেখ করে তিনি বলেন, দেশে ধর্ষণের বিচার হয় না। নারী নির্যাতন তুঙ্গে। আমরা কি সব বিষয় নিয়ে রাস্তায় নামব। অর্পিত সম্পত্তি আইন বাস্তবায়নের জন্য লড়াই করতে হবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, সংখ্যালঘুদের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমিশন থাকে। বাংলাদেশে এরকম একটি কমিশন হতে পারে। কমিশনে প্রধানমন্ত্রী যদি চান তার প্রতিনিধি রাখতে পারেন।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের উপদেষ্টা কাজল দেবনাথ বলেন, এখন পর্যন্ত যে আইন আছে, তা মন্দের ভালো। আমরা মেনে নিয়েছি। বাস্তবায়িত হলে আমরা মেনে নেবো। কিন্তু তহশিলদার, এ সি ল্যান্ড, জেলা প্রশাসক, মন্ত্রণালয়ের আমলা, এমন কি মন্ত্রী পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা বাস্তবায়নে মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আরও স্পষ্ট করে বললে, বলতে হয়, বিগত ৫০ বছর যাবৎ অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে সাপলুডো খেলছেন আমলা থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত। এখানে ভুক্তভোগীরা হলেন গুঁটি, আমলারা বিষধর সর্প। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা বাস্তবায়নে শেষ ছোবলটি মেরেছেন আইনমন্ত্রী। 'ক' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল এবং আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় ভুক্তভোগীদের পক্ষে হলেও মন্ত্রীর নির্দেশে প্রত্যর্পণ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে স্থগিত হয়ে রয়েছে।

সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সহসভাপতি অ্যাডভোকেট তবারক হোসেইন, বাস্টের আইন উপদেষ্টা এস এম রেজাউল করিম। সেমিনারের সহযোগিতায় ছিল অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন নাগরিক সমন্বয় সেল।

ভাস্কর্য অপসারণ বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক পরাজয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পীযূষ ভট্টাচার্য। সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক বাসুদেব ধর।

আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেন, আজ অত্যন্ত শংকার সঙ্গে লক্ষ্য করছি, পাঠ্যবইয়ে রবীন্দ্রনাথ থাকছেন না, বেগম রোকেয়া, জীবনানন্দ বাদ হয়ে যাচ্ছেন। হেফাজতিরা একেবারে মূল জায়গায় হাত দিয়েছে। তবে কি ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গবন্ধু, নজরুল, জীবনানন্দের বাংলাদেশ থাকবে না? তেতুল পীর সাহেবের বাংলাদেশ হয়ে যাবে? তিনি বলেন, হিন্দুরা দেশত্যাগ করছে, প্রগতিশীল, আলোকিত মুসলমানরাও তো থাকতে পারবে না। আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রশ্ন করেন, আওয়ামী লীগ কি আবার আওয়ামী মুসলিম লীগের দিকে যাবে? আপস করে তো এগুনো যাবে না। শুনেছি পুলিশ পাহাড়ায় পূজা করতে হয়। এই অবস্থা তো আমরা চাইনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমি বলেছি, এটা কবরের শান্তি। উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন, আইনের শাসন।

আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, কেউ কেউ বলেছিলেন, এটা সাম্প্রদায়িক সংগঠন। কারণ এই সংগঠনে মুসলমান নেই। আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, সমঅধিকারের জন্য এই সংগঠন কাজ করে, এই সংগঠন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। ওই সময়ে ঐক্য পরিষদের জন্ম হয়েছে যথার্থভাবেই। এই সংগঠনের প্রয়োজন আজ আরও বেশি। তিনি বলেন, মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, যখন শুনলাম নিরীহ স্কুলশিক্ষক শ্যামল ভক্তকে নেহাৎ প্রতিহিংসার বসে জেলে পোরা হয়েছে। এতে ভয়ভীতি আরও বাড়বে। সংখ্যালঘুদের মধ্যে আরও আতঙ্ক ছড়াবে। এই পরিস্থিতি মুক্তিযুদ্ধের শক্তির পক্ষে যায় না। বোধোদয় হতে হবে, নইলে দেশ বাঁচবে না।

রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, পরপর দুটি ঘটনায় হতাশ হয়ে পড়েছি। হেফাজত ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক শক্তির দাবির কাছে মাথা নত করে সুপ্রিম কোর্টের সামনে থেকে ভাস্কর্য সরানো হয়েছে। এটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি বড় ধরনের আঘাত। অন্যদিকে স্কুলশিক্ষক শ্যামল ভক্তকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের সব ঘটনা আমরা জানি। এই দুটি ঘটনা কি সরকারের পক্ষে গেছে? আজ সৌদি জোটে গেছে বাংলাদেশ। এই জোটের বড় মুরুব্বি আমেরিকা। দুটি দেশই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। অথচ বাংলাদেশ মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টিকারী এই জোটে শরিক হয়েছে। সেনা পাঠালে কাজ করতে হবে পাকিস্তানের সাবেক সেনাপতি রাহিল শরীফের অধীনে। এই পাকিস্তান ১৯৭১ সালে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে বাংলাদেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আজ এমন এক দুঃসহ অবস্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে যা তাদেরকে দেশ ত্যাগে আরও উৎসাহিত করছে। সর্বশেষ সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে ভাস্কর্য অপসারণ ও নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক শ্যামল ভক্তকে গ্রেফতারের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ কোন পথে হাঁটছে এই দু'টি ঘটনাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশকে ইসলামিকরণ করতে ধারাবাহিকভাবে এই ঘটনাগুলো ঘটানো হচ্ছে।

শ্যামল কান্তি ভক্ত যদি জঙ্গি হতেন...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতীয় সংসদ সদস্য যদি শিক্ষকদের এমন শাস্তি দেন, সেটা তো আরও বড় অপরাধ।

শ্যামল ভক্তকে এমন অপমান করায় গোটা দেশ ব্যথিত হয়েছিল। দেখা গেল, দেশ জুড়ে তার অনেক ভক্ত। তারা সবাই রাজপথে, বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ কান ধরে ওঠবস করছে। এমন প্রতিবাদের মুখে চক্রান্তকারীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা মিথ্যা অভিযোগ আনতে প্ররোচনা দেয় এক শিক্ষককে। এ শিক্ষকের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় তাকে। ধিক এ শিক্ষক নামের কলঙ্ককে! এ অপরাধ যারা করেছে তাদের কি শাস্তি হবে না, সেটাই এখন প্রশ্ন।

বাংলাদেশের শিক্ষকদের অনেক সংগঠন আছে। তারা শ্যামল ভক্তকে কান ধরে ওঠবস করানোর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, শ্যামল কান্তিকে গ্রেফতার করার পর তেমন জোরালো প্রতিবাদ দেখা গেল না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় ৮০ বছর আগে লিখেছিলেন, বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে। এটা ছিল খেদোক্তি। তখন ব্রিটিশ শাসন। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তে মুক্ত বাংলাদেশে কেন আমাদের এমন খেদোক্তি করতে হবে?

শ্যামল ভক্তের অপরাধ যে তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। তিনি চক্রান্তের পথেও চলতে জানেন না। আর এটাই তার মহাশক্তি। এ শক্তির জোরেই তিনি সব চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়ে যাবেন, এ বিশ্বাস রাখি।

অর্জন কম নয়, পর্যায়ক্রমে বাধা পেরিয়ে যেতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এরশাদের অষ্টম সংশোধনীর প্রেক্ষাপটে ঐক্য পরিষদের জন্ম হয়েছিল। অনেক সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে এসে আজও দাবি করতে হচ্ছে, রাষ্ট্রধর্ম বাতিল কর। অষ্টম সংশোধনীর বিরুদ্ধে দুই বড় দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি হরতাল ডেকেছিল। কিন্তু স্বৈরশাসনের পতনের পর দুই বড় দলই ক্ষমতায় এসেছে, বিএনপি দু'বার, আওয়ামী লীগ তিন বার। রাষ্ট্রধর্ম কিন্তু বহাল রয়েছে।

বিকেলে আয়োজিত এ আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক গওহর রিজভী প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, অনেক চড়াই উৎরাই পেরোতে হচ্ছে। ঐক্য পরিষদের সংগ্রাম প্রাসঙ্গিক ও যথার্থ, মূল ধারার রাজনীতির সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে ঐক্য পরিষদকে। তিনি বলেন, আমাদের অর্জন কম নয়। বর্তমানে শেখ হাসিনার সরকার ঐক্য পরিষদের দাবি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। পর্যায়ক্রমে বাধা পেরিয়ে এগুতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, পরিস্থিতি অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির অনুকূলে, শংকিত বা হতাশ হওয়ার কিছু নেই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ থেকে বাংলাদেশ কখনো বিচ্যুত হবে না এই আশ্বাস আমি নিশ্চিতভাবেই দিচ্ছি।

ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভার সূচনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী ও শামসুল হুদা। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর অসুস্থ থাকায় অংশ নিতে পারেননি। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ।

এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ঐক্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার পটভূমি তুলে ধরে বলেন, তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ না করে তথাকথিত অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ২(ক) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রধর্ম সংযোজন করেছিলেন। এ দেশের রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোও এতে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, এর বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক গণ-আন্দোলন গড়ে না তুলে তারা রাষ্ট্রধর্ম বিল পার্লামেন্টে গৃহীত হবার পরের দিন দায়সারাগোছের অর্ধদিবস হরতালের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু তা যথাযথ পালনে আন্তরিকতার ঘাটতি অবাক বিস্ময়ে আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করেছি। আজকের বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক বাস্তবতা, তা ২৯ বছর আগে যে উদ্বেগ ও শংকা আমরা প্রকাশ করেছিলাম সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটতে দেখছি। সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদ তৃণমূলে ছড়িয়ে পড়েছে।

পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটেছে। নববর্ষের সর্বজনীন উৎসব সংকুচিত হচ্ছে। বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোকে একদিকে সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে গাঁটছড়া, অন্যদিকে সমঝোতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বিশ্বের আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গেলে বাংলাদেশকে 'গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র বলে পরিচয় দেয়া হলেও স্বদেশে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক কর্ণধাররা বাংলাদেশ 'মুসলমানের দেশ' বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। অতি সাম্প্রতিককালে (১৮ মে, ২০১৭)

পৃষ্ঠা ৭

---

২০ মে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনাসভায় সাধারণ সম্পাদকের স্বাগত বক্তব্য

মাননীয় সভাপতি, মান্যবর প্রধান অতিথি, সম্মানিত আলোচকমণ্ডলী,
সমবেত সুধীজন, ভাই ও বোনেরা

আজকের এ আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের সহৃদয় উপস্থিতির জন্যে সবাইকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। আজ ২০ মে মানবাধিকারকামী সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ তার জন্মের ২৯ বছর পার করতে চলেছে। এর একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আছে।

আমরা সবাই জানি, ৭৫'র ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে তাঁর সরকারকে উৎখাতের পর মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ উল্টোপথে হাঁটতে শুরু করে। কবি শামসুর রহমান তাঁর এক কবিতায় খেদোক্তি করে লিখেছিলেন, 'উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ'। 'মুক্তিযোদ্ধা'র আবরণে একশ্রেণীর পাকিস্তানি প্রেতাত্মা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির নীতি অনুসরণ করে এবং ৭২-র গণতান্ত্রিক সংবিধানকে ধর্মীয় মোড়কে আচ্ছাদিত করে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেয়। পাশাপাশি পাকিস্তানি আমলের মতো ধর্মীয় বৈষম্য, বঞ্চনা, নিগ্রহণ, নিপীড়নের মধ্য দিয়ে 'সংখ্যালঘু নিঃস্বকরণ' প্রক্রিয়া শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালের ২০ মে তথাকথিত ভোটারবিহীন নির্বাচনে নির্বাচিত পার্লামেন্টে 'রাষ্ট্রধর্ম বিল উত্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করে শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ে রাষ্ট্রের নাগরিকদের এক বিশাল অংশকে 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক'-এ পরিণত করার ঘৃণ্য অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয় স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী। এহেন রাষ্ট্রীয় অপকর্মের প্রতিবাদে এবং ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ইশতেহারে ঘোষিত 'সাম্য, সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার' সুনিশ্চিতকরণের লক্ষে মানবাধিকারের আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পন্থায় পরিচালনার লক্ষ্য নিয়ে এ সংগঠনের জন্ম। বস্তুত 'জেলা পরিষদ বিল'র বিরুদ্ধে আন্দোলনরত রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের 'রাষ্ট্রধর্ম' বিলের ব্যাপারে রহস্যজনক নীরবতা, মৃদু প্রতিবাদ এ সংগঠনের জন্মের পেছনে অন্যতম নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। ২০ মে রাষ্ট্রধর্মবিল পার্লামেন্টে পেশের দিনই ঢাকায় এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠনের পাশাপাশি একই দিনে একই সময়ে চট্টগ্রামে এর শাখা কমিটি গঠিত হয়।

রাষ্ট্রধর্ম বিল পেশের দু'দিন পর ২২মে, ১৯৮৮ অর্থাৎ যে দিন তা নিয়ে আলোচনা হবার কথা সেদিনই সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির পক্ষে মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীর উত্তম, সাবেক আইন পরিষদ সদস্য এ্যাডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদার (প্রয়াত), ভদন্ত বোধিপাল মহাথেরো (প্রয়াত), ব্যারিস্টার সুধীর চন্দ্র দাস (প্রয়াত) ও অধ্যাপক মানিক গ্যাব্রিয়েল গোমেজ পার্লামেন্টের স্পিকার বরাবরে এক স্মারকলিপি পেশ করে আনিত বিলের ব্যাপারে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। স্মারকলিপিতে বলা হয়, 'একটি রাষ্ট্র, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতির রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিরূপ হওয়াতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে একমাত্র রাষ্ট্রধর্মরূপে ঘোষণা করার ফলশ্রুতি হবে ইসলাম ভিন্ন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশের অধিবাসীদের বিজাতীয়করণ, সমান নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ, ধর্মানুশাসন পালনে রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণ, জাতির সাথে একাত্ম থেকে সার্বিক উন্নয়নে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকা, পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনের সম্ভাবনা, শিশুকাল থেকে বিধর্মী বলে পরিচিত হবার আশংকা তথা গোটা জাতির একটা মিলিত অবস্থান থেকে বঞ্চিত করে ধর্মভিত্তিক সংকীর্ণ পৃথক অবস্থানে ঠেলে দেওয়া, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে প্ররোচনা দেওয়া যাতে সার্বভৌমত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি হয়। জন্মসূত্রের পরিবর্তে ধর্মসূত্রে প্রাপ্ত বিশেষ নাগরিক অধিকার গোটা জাতির সার্বিক অস্তিত্বের উপর আঘাত হানবে বলেই আমরা আশংকা করি।' ঐদিন চট্টগ্রাম থেকেও সংগঠনের চট্টগ্রাম আহ্বায়ক কমিটি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সমীপে স্থানীয় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এক স্মারকলিপি পেশ করে, যাতে বলা হয়, 'বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের কাছে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৪ বছরের নির্মম অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ অভিজ্ঞতা থেকেই তাদের স্থির বিশ্বাস রাষ্ট্রীয় ধর্মবিল গৃহীত হলে পবিত্র ধর্মকে শুধুমাত্র নিছক রাজনৈতিক স্বার্থেই ব্যবহার করা হবে যার ফলে (ক) এদেশে কেবল ইসলাম ধর্মই সম্পূর্ণভাবে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য পাবে (খ) ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারকল্পে সবধরণের সরকারি সম্পদ ব্যবহৃত হবে (গ) রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও আইন ক্রমশঃ ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হবে (ঘ) ক্রমান্বয়ে হলেও আবশ্যিকভাবে সংবিধান পরিবর্তন করে বাংলাদেশ 'গণপ্রজাতন্ত্র' থেকে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র'-এ রূপান্তরিত হবে। তখন ইসলামি আইনকানুনমতে দেশ চলবে (ঙ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো কেবলমাত্র 'জিম্মি' (hostage) হিসেবে গণ্য হবে অর্থাৎ তারা তৃতীয় শ্রেণীর অধিবাসীতে পরিণত হবে (চ) জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ইসলামই কেবল গুরুত্ব পাবে (ছ) বর্তমানে সরকারি চাকুরি ও পদমর্যাদা, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সম্পত্তি অর্জন ও সংরক্ষণসহ জীবন-জীবিকার সর্বপর্যায়ে সংখ্যালঘুরা যে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তা ব্যাপকতা ধারণ করবে (জ) ইসলামি বিচারব্যবস্থা চালু হবে পাকিস্তানের মতো (ঝ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো নিজস্ব ধর্ম প্রচারে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হবে (ঞ) সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মৌলবাদী ও কট্টরপন্থীগণ নানান উছিলায় সাম্প্রদায়িক বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করবে (ট) অনিশ্চয়তার কারণে বিপুলসংখ্যক দেশবাসীকে উচ্ছেদপূর্বক দেশত্যাগে বাধ্য করা হবে।' এ স্মারকলিপিতে সই করেছিলেন মাষ্টারদা সূর্যসেনের সহযোদ্ধা, সাবেক আইন পরিষদ সদস্য প্রয়াত বিনোদ বিহারী চৌধুরী, পিটার সাহা (প্রয়াত), অমলেন্দু ভট্টাচার্য (প্রয়াত), ড. বিকিরণ বড়ুয়া, এ্যাডভোকেট রাণা দাশগুপ্ত ও প্রিয়তোষ বড়ুয়া (প্রয়াত)।

এহেন আশংকা ও উদ্বেগ ব্যক্ত করা সত্বেও, এ কথা ঠিক, তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার তাতে কোনপ্রকার ভ্রুক্ষেপ না করে তথাকথিত অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ২(ক) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রধর্ম সংযোজন করেছিলেন। এ দেশের রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোও এতে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, এর বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক গণ-আন্দোলন গড়ে না তুলে তারা রাষ্ট্রধর্ম বিল পার্লামেন্টে গৃহীত হবার পরের দিন দায়সারাগোছের অর্ধদিবস হরতালের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু তা যথাযথ পালনে আন্তরিকতার ঘাটতি অবাক বিস্ময়ে আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করেছি। আজকের বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক বাস্তবতা তা ২৯ বছর আগে যে উদ্বেগ ও শংকা আমরা প্রকাশ করেছিলাম সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটতে দেখছি। সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদ তৃণমূলে ছড়িয়ে পড়েছে। পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটেছে। নববর্ষের সর্বজনীন উৎসব সংকুচিত হচ্ছে। বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোকে একদিকে সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে গাঁটছড়া, অন্যদিকে সমঝোতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা যাচ্ছে। বিশ্বের আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গেলে বাংলাদেশকে 'গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র বলে পরিচয় দেয়া হলেও স্বদেশে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক কর্ণধাররা বাংলাদেশ 'মুসলমানের দেশ' বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। অতি সাম্প্রতিককালে (১৮ মে, ২০১৭) মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীও এ ভাষায় সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরেছেন। অথচ এ কথাতো সত্যি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্যে বাঙালি ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করেনি, কিংবা মুসলিম রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' ভেঙ্গে আরেক মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্মের জন্যে ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ হয় নি। অর্থনীতিসহ অনেকক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন ঘটলেও, মাথাপিছু গড় আয় বাড়লেও ধর্মীয়-জাতিগত জনগোষ্ঠীর হার কেন কমছে, কেন তারা দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছে সে ব্যাপারে কারো কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

ঐক্য পরিষদ গঠনকালে মোট ৭ টি দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। এর মধ্যে ২টি ছিল সংবিধান সম্পর্কিত যাতে বলা হয়েছিল, 'রাষ্ট্রধর্ম সংক্রান্ত সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বাতিল এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির আলোকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ, বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।' আরো বলা হয়েছিল, 'যদি সংবিধানের প্রস্তাবনার শিরোনামে কোন ধর্মীয় বিশ্বাস বিবৃত করতে হয় তা হলে সর্বধর্মগ্রাহ্য 'পরম সৃষ্টিকর্তার নামে আরম্ভ করিলাম' সংযোজন করতে হবে।'

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ইতোপূর্বে সামরিক ফরমান বলে বাতিলকৃত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'সহ চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ফিরে এসেছে, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'-র নীচে ঐক্য পরিষদের দাবির আলোকে 'পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে' শব্দাবলী সংযোজিত হয়েছে কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষতা' 'রাষ্ট্রধর্ম'-র কাছে বন্দী হয়ে পড়েছে। এ বন্দীদশা থেকে যদি মুক্ত করা না যায় তবে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা' করা যাবে না। ৩ নম্বর দাবিতে বলা হয়েছিল, 'প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিভাগ, সরকারি প্রশাসন, সরকার নিয়ন্ত্রিত সকল প্রতিষ্ঠানসহ সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থান ও রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে এবং শিল্প ও বাণিজ্যসহ জীবনের সকল বৈষয়িক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম-অধিকার দিতে হবে।' অস্বীকারের উপায় নেই, বিগত কয়েকবছরে এক্ষেত্রে বেশ খানিকটা অগ্রগতি ঘটেছে তবে সম-অধিকার আজও আমরা ফিরে পাইনি। ৪ নম্বর দাবিতে বলা হয়েছিল, 'আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের নিজ নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখার অধিকারসহ সর্বপ্রকার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে হবে।' এরই আলোকে এবং আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের সশস্ত্র সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলেও এর যথাযথ বাস্তবায়ন আজও ঘটেনি। ৫ নম্বর দাবিতে বলা হয়েছিল 'কুখ্যাত অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল করতে হবে।' এ দাবির প্রেক্ষিতে ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পার্লামেন্টে গৃহীত হলেও এবং বিগত ২০১১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে আরো ৪টি ইতিবাচক সংশোধনী এলেও, দুঃখজনক হলেও সত্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সদিচ্ছা আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তে তার যথাযথ বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটছে। ৬ নম্বর দাবিতে বলা হয়েছিল, 'সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতা প্রতিরোধ করতে হবে ও ধর্মের ভিত্তিতে সকল বৈষম্য, নির্যাতন ও নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে।' 'হলি আর্টিজেন' ঘটনার পর সরকারপ্রধান সন্ত্রাস ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপর থেকে আইন-শৃংখলা বাহিনী অদ্যাবধি জঙ্গীদের দমনে কার্যকর ভূমিকাও পালন করে চলেছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতা প্রতিরোধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে রাজনৈতিক আদর্শ তৃণমূলে প্রোথিত করা দরকার সেখানে দৃশ্যমান কোন পদক্ষেপ আজও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে ধর্মীয় বৈষম্যের অবসানে কিঞ্চিত পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হলেও তা উলেখ্য নয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের আরো অনেক করণীয় আছে বলে আমরা মনে করি। অব্যাহত নির্যাতন-নিপীড়নের হাত থেকে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুরা আজও মুক্তি পায়নি। ৭ নম্বর দাবিতে বলা হয়েছিল, 'তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমির অজুহাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও হয়রানী বন্ধ করতে হবে।' আজ স্বাধীন বঙ্গভূমির আওয়াজও নাই, এ অজুহাতে নির্যাতন-নিপীড়ন নাই। তবে 'মহানবীকে কটুক্তি করার বা ইসলাম ধর্মকে কটাক্ষ করার কল্পিত অভিযোগ তুলে অহেতুক সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের কোন কমতি নাই। সুপ্রীম কোর্টের সামনে স্থাপিত ভাস্কর্যকে 'মূর্তি' অভিধায় তা অপসারণের দাবি তুলে অন্যথায় সংখ্যালঘুদের উপর হামলার হুমকি আজ সারা দেশে অব্যাহতভাবে চলছে। এহেন প্রচারণাকারীদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা আজও আমরা শুনি নি। সংখ্যালঘুদের উপাসনালয়ে হামলাকারীদের ক্ষেত্রে দায়মুক্তির সংস্কৃতি অব্যাহত আছে। তবে কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ ধরে পুলিশে দিলে থানা কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হয়, হয় সে পাগল না হলে নেশাখোর।

বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতির ইতিহাস নিবিড়ভাবে বিশেষণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আলী রিয়াজ। Bangladesh A Political History Since Independence নামে তাঁর একটি গবেষণাগ্রন্থ বেরিয়েছে ২০১৬ সালের শেষ দিকে। লন্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে একযোগে এটি প্রকাশ করেছে 'আইবি টরিস' নামের একটি প্রকাশনা সংস্থা। তিনি তাঁর এ বইতে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথম ৪২ বছরে দেশটির রাজনৈতিক দৃশ্যপট তিনটি আঙ্গিকে ডানপন্থার দিকে ঝুঁকেছে। প্রথমত, নতুন নতুন রক্ষণশীল দলের জন্ম হয়েছে, দ্বিতীয়ত, বামপন্থী দলগুলো ক্রমেই দুর্বল হয়েছে এবং তৃতীয়ত, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করছে। তাঁর মূল্যায়নে বাংলাদেশে এখন যে ব্যবস্থা চলছে তা হচ্ছে, দো-আঁশলা গণতন্ত্র, ইংরেজিতে হাইব্রীড ডেমোক্রেসি। সেই গণতন্ত্রে দ্বি-দলীয় নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব যে বাড়বে তাতে আর বিস্ময় কি?'

এহেন পরিস্থিতি বাংলাদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের সংকটে নিক্ষেপ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে অস্তিত্বের সংকট থেকে উত্তরণ এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষাধিক জনতার মহা-সমাবেশে গৃহীত হয় প্রাণের দাবি ৭ দফা, যাতে স্থান পেয়েছে- ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ, সম-অধিকার ও সমমর্যাদা, স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ সম্পর্কিত দাবিসমূহ। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের গত ৮ এপ্রিল, ২০১৭-কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে আগামী নির্বাচনের পূর্বেই সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন বাধ্যতামূলককরণ এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণার জন্যে সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো হয়েছে।

এও বলা হয়েছে, প্রাণের দাবি ৭ দফা যে রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের নির্বাচনি ইস্তেহারে অন্তর্ভুক্ত করবে সে দল বা জোটের পক্ষে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের অবস্থান থাকবে। কাউন্সিলে গৃহীত আরেক প্রস্তাবে যেসব জনপ্রতিনিধি অতীতে বা বর্তমানে সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী ভূমিকা পালন করেছে বা করছে তাদের কাউকে আগামি সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেয়ার জন্যে সব রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে। পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, কোথাও যদি এর অন্যথা ঘটে তবে সে সব নির্বাচনী এলাকায় সংখ্যালঘুরা প্রয়োজনে ভোট বর্জন করবে।

নির্বাচনে নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে যাতে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ভোট দিতে পারে তার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতের জন্যে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কাছে জোর দাবি জানিয়ে কাউন্সিল অধিবেশনে বলা হয়, যদি তা না হয় তবে সংখ্যালঘুরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি না তা তারা ভেবে দেখতে বাধ্য হবে। আশা করতে চাই, সংখ্যালঘু জনজীবনের যে বিদ্যমান সমস্যা, সংকট, হতাশা তা রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক দল যথাযথভাবে বিবেচনা করবে। 'ভোটব্যাংক' বা 'আপদ' ভেবে যদি তাদের রাজনৈতিক বিবেচনার বাইরে রাখা হয় তবে তা কারো জন্যে শুভ হবে বলে মনে করি না।

আমরা শান্তি চাই, স্বস্তি চাই, জীবনের নিরাপত্তা চাই, নাগরিক হিসেবে নাগরিকের মর্যাদা চাই, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ চাই- সে লক্ষ্যে ঐক্য পরিষদের সংগ্রাম চলছে, চলবে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

রানা দাশগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক

বি চি ন্তা

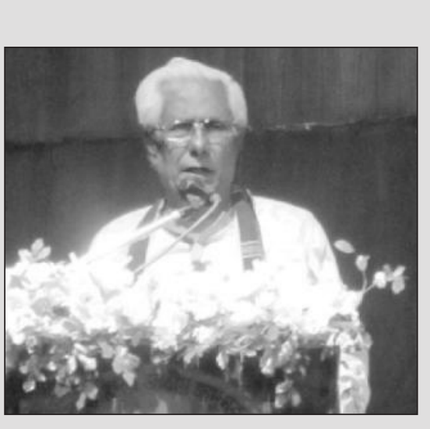

আমার আমি

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

(গত সংখ্যার পর)

আরেকটি বিষয় গভীরভাবে তলিয়ে ও খতিয়ে দেখা হয় নি যে, ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলী থেকে পাকিস্তানকে তালাক দিয়ে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয় এটি এক সরলীকরণের দোষে দুষ্ট অলীক ধারণা মাত্র। ক্রমাগত পাক শাসকগোষ্ঠি পূর্ব বাংলার জনগণের উপর অর্থনৈতিক (যা 'দুই অর্থনীতি' নামে খ্যাত) সামাজিক- সাংস্কৃতিক- বঞ্চনা- বৈষম্য ও অবিচারের যোগফল হিসাবে – একনাগাড়ে দ্রুততালে স্বাধীন বাংলাদেশের লক্ষ্যটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেনি। এটি তখনিই অনিবার্য হয়ে উঠে প্রাথমিক ভাবে ভারত- পাকিস্তান যুদ্ধে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তাহীন ও পরিত্যক্ত অবস্থা, ৭০ সনে গোর্কির ছোবলে ১০ লক্ষ নর-নারী-শিশুর বেঘোরে মৃত্যুতে শাসকগোষ্ঠির অবজ্ঞা-অনাদর-অবহেলা, সর্বোপরি ২৫ শে মার্চের কালরাত্রিতে পাকহানাদারদের পরিকল্পিত বর্বরতম হত্যাকান্ডের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন সার্বভৌম বাংলাদেশের উত্থানের সর্বজনীন চাহিদা তারও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। আরও একটি বিষয় বিবেচনা থেকে এড়িয়ে যায় যে, ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশের বিভাজনের পক্ষে যে বিপুল পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম জনগণ উদ্দীপিত ছিল তাদের চেতনার জগত থেকে সাবেকী চিন্তা তথা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শস্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর কর্পূরের মতো উবে যাবে সে রূপ ভাবনাও সুবিবেচনা প্রসূত ছিল না।

তাইতো ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বরের কিছুদিনের মধ্যে 'মুসলিম বাংলা' দাবিতে জনমত গড়ে তোলার বাস্তব ভিত্তি সৃষ্টি হয় সমাজের মধ্য থেকেই। অথচ বাঙালিসহ আদিবাসী জনগণের মুক্তি সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিসারী পথরেখা নির্ণীত হয় নি, কিন্তু এই সময়ে অতি দ্রুতবেগে মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছে উলেখযোগ্যভাবে। পাশাপাশি প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি স্বাধীনতার বিরোধী পক্ষকে তেজী ও জোরদার করে। এছাড়া রাজনীতির বক্সর পথ মাড়িয়ে আধা সামন্তবাদী পথ ধরে মধ্যবিত্তের বিকাশটাকে হয়ত প্রভাবিত করা যেতো ইতিবাচক ধারায় যদি দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে জমায়েত হওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দিয়ে কার্যকর ভাবে প্রশিক্ষিত জনশক্তির অভাব ও শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব হতো। জাতীয়তাবাদের আদর্শিক আবেগজাত চেতনার সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টির কাজটিও সুসম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল।

জাতীয় ট্র্যাজেডী : বুদ্ধিজীবি হত্যা

মুক্তিযুদ্ধের বিজয় যখন অনিবার্য- প্রায় এবং শেষ পর্যায়ে এমনি সময়ে ৩রা ডিসেম্বর পাক সামরিক জান্তার ভারত আক্রমণের পর পরই এবং ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে মিত্রবাহিনী ও মুক্তি বাহিনীর যৌথ সামরিক প্রতিরোধের মুখে একের পর এক জেলায় পরাজিত পাক বাহিনী যখন পিছু হটেছে এবং পাশাপাশি মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠছে একের পর এক জেলায়। তখন পাক হানাদার বাহিনীর ঘনিষ্ঠ বিদেশী মিত্ররা বিশেষভাবে মার্কিন ও চীনারা কূটনৈতিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বার বার ভেটো অস্ত্র তারা প্রয়োগ করেন। যদিও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এর বিরুদ্ধে পাল্টা ভেটো প্রয়োগ করে একের পর এক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে রাহুমুক্ত করেন।

এসময় পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিতে ৭ম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরে যেতে নির্দেশ দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, অন্যদিকে সিকিম- ভুটান সীমান্তে চীনা বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি অব্যাহত রাখা হয়, সেই সময়ে বিশেষত ১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে নিয়ে জাতিসংঘে চীনা যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৃতীয় ভেটো প্রয়োগ হয়। ঠিক বিজয়ের প্রাক- মুহূর্তে ১৩ ই ডিসেম্বর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাক সেনাবাহিনীর অধীনে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। লক্ষ্যণীয় যে, ঐ দিনই মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের দ্বারা ঢাকার চতুর্দিক অবরুদ্ধ করা হয়। পাক বাহিনীর অনিবার্য পরাজয় জেনেও ঠান্ডা মাথায় ঐ জল্লাদবাহিনী বিজয়ী বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করবার কর্ম পরিকল্পনা কার্যকর করতে জরুরী ভিত্তিতে কাজে নামে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাক সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে রাজাকার, আলবদর ও আল সামসদের নিয়ে এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

> ঐ বৈঠক থেকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে উক্ত বাহিনীগুলোকে দিয়ে নানান কিলিং গ্রুপ তৈরী করা হয়, ঐসব গুপ্তঘাতকদের দায়িত্ব দেয়া হয় বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের তথা জাতির সেরা সন্তানদের হত্যা করার, ইতোপূর্বে ২৫ শে মার্চের কালোরাত্রিতে ছাত্র বস্তিবাসী- ঢাকাবাসী ও শিক্ষাবিদদের হত্যার ঘটনা ছিল পাক বাহিনীর কলঙ্কজনক প্রত্যক্ষ গণহত্যা। এক কথায় জাতীয় মেধাহত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করে এই কলঙ্কজনক ঘটনাটি বিশ্ব পরিসরে তুলে ধরা, জাতীয় ভাবে ঢাকাসহ সারা দেশের শহীদ বুদ্ধিজীবিদের জাতীয় তালিকা প্রণয়ন, তাঁদের জাতীয় স্বীকৃতি, মর্যাদা ও সম্মান দিতে রাষ্ট্রের অনুদারতা পীড়াদায়ক হয়ে দেখা দিয়েছে।
> শুধু শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস নয়, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসও ক্রমে ক্রমে প্রাণহীন আবেদনহীন আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হতে চলেছে এরূপ প্রশ্নের তীর ধেয়ে আসছে বিবেকবান ঐতিহ্য সচেতন নরনারীর মনে রাষ্ট্রের দায়সারা আচরণে।

ঐ বৈঠক থেকে বাঙালি বুদ্ধিজীবি হত্যার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে উক্ত বাহিনীগুলোকে দিয়ে নানান কিলিং গ্রুপ তৈরী করা হয়, ঐসব গুপ্তঘাতকদের দায়িত্ব দেয়া হয় বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের তথা জাতির সেরা সন্তানদের হত্যা করার, ইতোপূর্বে ২৫ শে মার্চের কালোরাত্রিতে ছাত্র বস্তিবাসী- ঢাকাবাসী ও শিক্ষাবিদদের হত্যার ঘটনা ছিল পাক বাহিনীর কলঙ্কজনক প্রত্যক্ষ গণহত্যা।

এক কথায় জাতীয় মেধাহত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করে এই কলঙ্কজনক ঘটনাটি বিশ্ব পরিসরে তুলে ধরা, জাতীয় ভাবে ঢাকাসহ সারা দেশের শহীদ বুদ্ধিজীবিদের জাতীয় তালিকা প্রণয়ন, তাঁদের জাতীয় স্বীকৃতি, মর্যাদা ও সম্মান দিতে রাষ্ট্রের অনুদারতা পীড়াদায়ক হয়ে দেখা দিয়েছে।

শুধু শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস নয়, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসও ক্রমে ক্রমে প্রাণহীন আবেদনহীন আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হতে চলেছে এরূপ প্রশ্নের তীর ধেয়ে আসছে বিবেকবান ঐতিহ্য সচেতন নরনারীর মনে রাষ্ট্রের দায়সারা আচরণে। একাত্তরের পাক হানাদার বাহিনীর প্রধান সহযোগী ও এদেশীয় অনুচরবাহিনী আলবদর, আলসামস, রাজাকারের নিয়ন্ত্রক স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে ইসলামি ও তাদের আদর্শিক সহযোগীরা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে কেন নিষিদ্ধ হয় না? স্বাধীনতাবিরোধীরা কেন প্রধান ধারার রাজনীতির দলসমূহের কাছে এখনও আদরণীয় তাও বিস্ময়ের বিষয় হয়ে উঠেছে। অনুরূপ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সোপান রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম দিবস বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রভাষা দিবসে রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে তা সত্ত্বেও অতীতের মত প্রভাত ফেরীর নগ্নপদ লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশুর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গণআর্তির অমর বাণী গীত হয় না এবং জনমন আর উদ্বেলিত করে না, উপরন্তু মধ্যরাত্রির আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হতে চলেছে আত্মপরিচয়ের ঐতিহ্যবাহী গণসংগ্রামের লাল রক্তে লেখা এই দিনটিও। দেশের সেরা সন্তানদের ধরে এনে একে একে হত্যা করার পরিকল্পনা মোতাবেক বিভিন্ন বধ্যভূমিতে নিয়ে চরম বর্বরতার সাথে এদের হত্যা করে শকুন- শেয়ালের মহাভোজের উপাদান করা হয় প্রকাশ্য স্থানে, ইসলাম ধর্ম রক্ষায় সোচ্চার হত্যাকারীরা তাদের হত্যার শিকার মুসলমান ভাইবোনদের দাফনের ধর্মীয় বিধান মানার সামান্যতম চেষ্টাও করেনি। ওরা ১৪ ডিসেম্বর সর্বাধিক সংখ্যক বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। ১৫ই ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশটি যুদ্ধ জাহাজ ভারত মহাসাগরে মোতায়েন করা হয় মুক্তিযুদ্ধের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য। একই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রধান লে: জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ নিয়াজী কর্তৃক জেনারেল মানেকশ- এর নিকট আত্মসমর্পণের স্বীকৃতি জানিয়ে তারবার্তা পাঠান- তদনুযায়ী ১৬ ডিসেম্বর ৪ টা ৩১ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ সম্পাদন এবং আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর দানের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে কলঙ্কজনক রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় এবং শোচনীয় পরাজয় মুহূর্তেও পাক হানাদাররা ধর্মের নামে তাদের এদেশীয় গুপ্তহত্যা বাহিনীদের লেলিয়ে দেয় নারকীয় এই হত্যাযজ্ঞে যা ১৯৭২ সনের ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অতিশয় আশ্চর্যজনক যে, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য এই ঘটনাটি চরম লজ্জা ও অগৌরবের তা বিজয়ী জাতি ও রাষ্ট্রযন্ত্র গভীর গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়নি। তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা- মুক্তিবাহিনী- মিত্রবাহিনীর বিজয়ানন্দের মধ্যেও ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই হত্যাকান্ড কি ভাবে অব্যাহত থাকলো সেই আত্মজিজ্ঞাসায় বিজয়ী জাতি সোচ্চার কেন হয়নি? আলবদরের হাতে অপহৃত শহীদুল্লাহ কায়সারকে উদ্ধার করতে তার ভাই জহির রায়হান কেন নিখোঁজ ও হত্যার শিকার হন জাতীয় নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রযন্ত্র তাঁর কোন ব্যাখ্যা অদ্যাবধি দেয়নি।

প্রতি বছর ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস আনুষ্ঠানিকতার সাথে পালিত হয়। জাতির বিবেকদের হত্যাযজ্ঞকে যথারীতি অন্তঃসারশূন্যভাবে স্মরণ করা হয়। এই জাতীয় ট্র্যাজেডি নিয়ে পরিপূর্ণ তদন্ত, পূর্ণ বিচার কার্য এবং হত্যাকারীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দান এবং শহীদদের রাষ্ট্রীয় সম্মান ও মর্যাদা দানে বাংলাদেশ সক্ষমতার পরিচয় দিতে আজও অপারগ রয়েছে। পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক বর্ণবাদী ঔপনিবেশিক মতাদর্শের অনুসারীরা বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবি- হন্তা স্বাধীনতার শত্রুদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সহাবস্থান মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে বিস্ময়কর হলেও নির্মম সত্য।

(চলবে)

'ওই পরিবার আমাকে যে কোন সময় নিশ্চিহ্ন করতে পারে'

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

নারায়ণগঞ্জের স্কুল শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত বলেছেন, স্কুল থেকে বিতাড়িত করতেই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্রের একটি মাত্র কারণ আমি হিন্দু। হিন্দুকে বিতাড়িত করতেই এই কারসাজি। তিনি বলেন, আমাকে সারাক্ষণ মানসিক নির্যাতনের মধ্যে রাখা হচ্ছে। সরকার আমাকে যে নিরাপত্তা দিয়েছিল, সেই নিরাপত্তা কার হুমকিতে, কার নির্দেশে এবং কার জন্য তুলে নেওয়া হল? কোথায় যাব, কী করব জানি না। আমরা এ দেশের নাগরিক। সংখ্যালঘু কথাটি কেন আসবে? শ্যামল কান্তি ভক্ত ২৮ মে কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী সবিতা হালদার। শ্যামল কান্তি নিজের ও তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। একইসঙ্গে তার বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, আমার সংসার এখন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে, বলতে গেলে প্রায় ধ্বংসের পথে। আমি আতঙ্কিত কারণ ওই পরিবার আমাকে যে কোনো সময় নিশ্চিহ্ন করতে পারে। যে কোনো সময় যে কোনো কিছু হয়ে যেতে পারে।

কারাগার থেকে মুক্তির পর শ্যামল ভক্ত। পাশে তাঁর স্ত্রী ও আইনজীবি

নারায়ণগঞ্জে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

শ্যামল কান্তি ভক্ত গ্রেফতার হওয়ার পর দিনই বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, সভাপতিমণ্ডলির সদস্য সাংবাদিক বাসুদেব ধর ও সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম কুমার চক্রবর্তী নারায়ণগঞ্জ ছুটে যান। তাঁরা ভক্তের বাড়ি পরিদর্শনের পর স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, শ্যামলবাবুকে গ্রেফতার পুরোপুরি ষড়যন্ত্রমূলক, যার শুরু গত বছর ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগ থেকে। স্থানীয় সাংসদ এই নিবেদিত প্রাণ শিক্ষককে স্কুল থেকে উৎখাত করতেই এই ষড়যন্ত্র করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এক পর্যায়ে গত বছর এই শিক্ষককে কান ধরে উঠবস করানো হয়। সারাদেশে এর প্রতিক্রিয়া ছিল মারাত্মক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হস্তক্ষেপ করেছে শ্যামলবাবুর লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি। সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর এখন নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে।

বি চি ন্তা

সংখ্যালঘুর দেশত্যাগ : নির্বাচনকালীন সহিংসতা ও অন্যান্য অনুসঙ্গ

প্রিয়া সাহা

(গত সংখ্যার পর)

সেই সহিংসতা এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভয়ভীতি ও অত্যাচার নির্যাতনে কর্ণাইয়ের অনেকেই দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। অভিযুক্তদের অনেকেই রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। তারা সংখ্যালঘুদের উপর বিভিন্ন রকম ভয়ভীতি অত্যাচার নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। আতঙ্ক আর অনিরাপদ আগামির ভাবনা কর্ণাইয়ের হিন্দুদের যেন নিত্য সহচর।

কর্ণাই-এর অবস্থান দিনাজপুর জেলা শহরের খুব কাছেই। এই গ্রামে আছে হাজীপাড়া, প্রিতমপাড়া, বৈদ্যপাড়া, তেলিপাড়া, সাঁওতালপাড়া, বনিপাড়া, যুগিপাড়া, সাহাপাড়া। সেই সময়ে সংঘবদ্ধ আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন হাজীপাড়া, প্রিতমপাড়া, বৈদ্যপাড়া, তেলিপাড়া, ও সাহাপাড়ায় বসবাসরত হিন্দুরা। ভোট বিরোধীরা ৫ জানুয়ারি দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে হিন্দুদের দোকান-পাট, বাড়ি-ঘরে হামলা করে, অগ্নিসংযোগ করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সহিংসতার শিকার এসব বাড়ির সদস্যরা পালিয়ে যান। আওয়ামী লীগ সমর্থক দু একটি মুসলিম পরিবার এসময় তাদের হাতে আক্রান্ত হলেও তাদের মূল টার্গেট ছিল সংখ্যালঘুরা।

ঘটনার অব্যবহিত পরে কর্ণাই গ্রামে গিয়ে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে নি। সেখানে ৩০/৩৫টি দোকানের প্রায় সবগুলোর কোনটিতে অগ্নিসংযোগ, কোনটিতে ভাঙচুর চালিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। এমন অবস্থা করা হয় যেন এই কর্ণাই বাজার একটা মৃতপুরী। দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সংঘবদ্ধ আক্রমণ ঘটনায় কোনো দোকান অক্ষত ছিলনা। কর্ণাই মোড় ও সংলগ্ন ভোট কেন্দ্রটি সাহাপাড়ার মধ্যে। তাই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখানেই সবচেয়ে বেশি ছিল। সন্ধ্যার আগে বিজিবি এলে হামলাকারীরা পালায়। কিন্তু বিজিবি চলে যাওয়ার পর রাতে আবারো হিন্দু পল্লীগুলোতে আতংকিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হলে গ্রামবাসীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আক্রান্ত জগৎ রায় বলেন, 'পুলিশ-বিজিবির হাত-পাও ধরি বইলছি, স্যার, আপনারা থাকেন, যায়েন না। ওরা থাকলি এত বড় ঘটনা ঘটত না।' এই হামলায় একসঙ্গে দেড় থেকে দুই হাজার মানুষ অংশ নেয় বলে ভুক্তভোগীরা জানান।

হামলার সাথে জড়িতরা স্থানীয় ভাষায় দেউরিয়া। সাধারণত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও এর আশে পাশের এলাকা থেকে আসা লোকজন দিনাজপুরে 'দেউরিয়া' হিসেবে আখ্যায়িত। এদের বেশিরভাগ রাজনৈতিক ভাবে জামায়াত সমর্থক, অনেকে সমর্থন করেন বিএনপিকে। দেউরিয়াদের মধ্যে আওয়ামী লীগের সমর্থক লোকের সংখ্যা খুবই কম। কর্ণাই সংলগ্ন মহাদেবপুর, ডুমুরতলী, কাঁটাপাড়া, বকরীপাড়া, আনিসপাড়ার লোকজনও এই হামলার সাথে জড়িত ছিল বলে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্য থেকে জানা যায়। তাছাড়া নদীর (পুনর্ভবা নদী) ওপারে অবস্থিত কাহারোলের শুকানদিঘী ও বিরলের কানাইবাড়ী থেকেও দেউরিয়ারা এসে হামলায় অংশগ্রহণ করেছিল।

আক্রান্ত ৭০ বছর বয়সী বিধবা পূর্ণিমা রায় চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে সেদিন বলছিলেন, ওমরা (হামলাকারীরা) ইট ভাঙ্গি ভাঙ্গি মারিছে। মোর বেটাক মারিছে। টাকা, চান্দি নিয়া গেইছে। ওমরায় আগুন ধরাইয়া দিয়া ওমরায় কহেছে নিভাও নিভাও! আরেকজন মধ্যবয়সী নারী তিরফুলি রায়ের (৪৫) বক্তব্য ছিল, হামরা ভয়তে বাড়িত থাকিবা পারছিনা বাও। যে সন্ত্রাস হচ্ছে তাতে বাড়িত কেং করি থাকমো? দীপ্তি নামের একজন বলছিলেন, ওমরা হামার বকরী, ছাগল সব নিয়া গেইছে। এখন কহেছে ভুট্টা বড় হইলে ভুট্টা কাটি নিয়া যাবে! তাইলে হামরা বাঁচিমো কেমন করি? হামরা ভোট দিছি, এখন ভোট দিয়াই দোষী হই গেইছি।

নির্বাচন পরবর্তীকালেও এখানকার হিন্দুদের উপর হুমকি-ধামকি অব্যাহত থেকেছে। সন্ত্রাসীরা বলে বেড়িয়েছে, আওয়ামী লীগ আর কতদিন? সরকার কি বদল হবে না? তখন তোমরা যাবে কোথায়? এভাবে হুমকি দিয়ে হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদে ভীতির সঞ্চার করা হয়। ফলে একসময় হিন্দুরা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যায়। কর্ণাই গ্রামের ২টি পরিবারের ১১জন ভারতে চলে গেছেন ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী মাত্র ১ সপ্তাহে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের কিছু সংবাদ শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ :

দিনাজপুরে সংখ্যালঘুদের বাড়ি দোকানে হামলা অগ্নিসংযোগ লুট (৬ জানুয়ারি,২০১৪ দৈনিক ইত্তেফাক)। অভয়নগরে হিন্দুদের ১২ বাড়িতে আগুন ১৩০টি ভাংচুর (৬ জানুয়ারি, ২০১৪ প্রথম আলো)। গাজীপুর ও দিনাজপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ৫ জন আহত, ১২ বসতঘরে আগুন(৬ জানুয়ারি, ২০১৪ আমাদের সময়)। বানিয়াচংয়ে তিন কেন্দ্র ও এক হিন্দু বাড়িতে পেট্রলবোমা (৬ জানুয়ারি, ২০১৪ সংবাদ)। Terror on Hindus-BNP-Jamaat men vandalise 130 houses, burn another 10 in Abhaynagar (6 January, 2014 The Daily Star)। চার জেলায় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা, আগুন, লুট (৭ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক ইত্তেফাক) বিএনপি-জামায়াতের ব্যাপক তান্ডব ৩ জেলায় সংখ্যালঘুদের ৬ শতাধিক বাড়িঘর আক্রান্ত (৭ জানুয়ারি, ২০১৪ আমাদের সময়) ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার অপরাধে হিন্দুদের ওপর জামায়াত শিবিরের হামলা (৭ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। গাইবান্ধায় বাড়ি-দোকান ভাঙচুর, মারধর (৮ জানুয়ারি, ২০১৪ প্রথম আলো)। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারীদের বিচারের উদ্যোগ (৮ জানুয়ারি, ২০১৪ প্রথম আলো)। বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ বিক্ষোভ, এ বর্বরতায় মানবতা বিপন্ন (ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়তে হবে) (৮ জানুয়ারি, ২০১৪ সংবাদ)। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে দেশ (৮ জানুয়ারি, ২০১৪ সংবাদ)। যশোর, দিনাজপুর, সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, সাতক্ষীরায় চলছে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, আগুন, লুট-এ বর্বরতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি আঘাত আতঙ্কে দিন কাটছে দিনাজপুরের সংখ্যালঘু পল্লীতে (৮ জানুয়ারি, ২০১৪ সংবাদ)। মালোপাড়ায় পুলিশ ক্যাম্প পাঁচজন আটক (৮ জানুয়ারি, ২০১৪ প্রথম আলো)। ঠাকুরগাঁওয়ে হিন্দুপাড়ায় ফের হামলা, ভাংচুর লুট,আগুন (৮ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক ইত্তেফাক)। হাতিয়ায় হামলায় আহত ৫, নির্বাচন এবং সংখ্যালঘুদের আতঙ্ক (৮ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক ইত্তেফাক)। সুন্দরগঞ্জে সহিংসতায় বসতবাড়ি ভাংচুর মধুখালীতে সংখ্যালঘু পরিবারে ডাকাতি (৮ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক ইত্তেফাক)। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ঠেকাতে চিরুনী অভিযান শুরু (৮ জানুয়ারি, ২০১৪ সংবাদ)। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সতর্ক হোন, রুখে দাঁড়ান (৮ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ) সংখ্যালঘুর ওপর হামলায় এফবিসিসিআইর উদ্বেগ (৮ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। Why Hindus always under assault? (8 January, 2014 The Daily Star)। আতঙ্কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (৮ জানুয়ারি, ২০১৪ আমাদের সময়)। সংখ্যালঘু নির্যাতন (৮ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সাংবাদিক মঞ্চের নিন্দা, সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলুন(৮ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। টিএসসিতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সমাবেশে বক্তারা, যৌথবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প, শঙ্কা কাটেনি, তবু বাড়ি ফিরছে সংখ্যালঘুরা(৮ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে মন্দিরে হামলা অব্যাহত (৯ জানুয়ারি, ২০১৪ সংবাদ)। জয়পুরহাটে আতঙ্কে একজনের মৃত্যু সাতক্ষীরায় আওয়ামী লীগ কর্মীর বাড়িতে আগুন, (৯ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। হিন্দুর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুট (৯ জানুয়ারি, ২০১৪ সংবাদ)। আদিবাসী পরিবারের ওপর হামলা বাড়িতে অগ্নিসংযোগ আহত ৭ (৯ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। জনগণের দৃষ্টি ফেরাতে পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চলছে- ফখরুল (৯ জানুয়ারি, ২০১৪ সংবাদ)। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলায় জড়িতদের শাস্তি দাবি বিএনপি'র (৯ জানুয়ারি, ২০১৪ সংবাদ)। দ্রুত বিচারে গঠিত হচ্ছে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল (১০ জানুয়ারি, ২০১৪ আমাদের সময়)। নাশকতা ঠেকাতে ৬৪ জেলায় ডিসি'র নেতৃত্বে কমিটি, বগুড়া বাগেরহাটে মন্দির প্রতিমা ভাংচুর আগুন (১০ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক ইত্তেফাক)। থামছে না সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস-আক্রান্ত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা (১০ জানুয়ারি, ২০১৪ সংবাদ)। আরও তিন মন্দিরে আগুন, ভাঙচুর (১০ জানুয়ারি, ২০১৪ প্রথম আলো)। চাঁপাতলায় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে (১০ জানুয়ারি, ২০১৪ প্রথম আলো)। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা দমন, কঠোর আইন পাসের দাবি (১০ জানুয়ারি, ২০১৪ প্রথম আলো)। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মিছিল, মানববন্ধন (১০ জানুয়ারি, ২০১৪ প্রথম আলো)। সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু পরিবারের নিরাপত্তা দাবি (১০ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। কলাপাড়ায় বিধবার শীলতাহানি, মামলা করে বিপাকে (১০ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। হাটহাজারীর হিন্দু বাড়িতে আগুন, ৫ বসত ঘর পুড়ে ছাই (১০ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। সংখ্যালঘু নিরাপত্তায় পাড়া-মহল্লায় গড়ে তুলুন প্রতিরোধ কমিটি (১০ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। বাগেরহাটে হিন্দু মন্দিরে আগুন, ভাংচুর (১০ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। নির্বাচনোত্তর সহিংসতার ভয়ে মালোপাড়ার মেয়েরা রাতে এলাকায় থাকে না (১০ জানুয়ারি, ২০১৪ আমাদের সময়)। বাগেরহাটে মন্দির ভাংচুর-১৮ দলের সাম্প্রদায়িক প্রতিশোধ (১০ জানুয়ারি, ২০১৪ আমাদের সময়)। হিন্দুদের আতঙ্ক কাটেনি, প্রতি মহল্লায় রাত জেগে পাহারা (১১ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। যশোরের ঋষিপল্লীতে স্বামী ও শ্বশুরকে বেঁধে রেখে দুই গৃহবধূ ধর্ষণ (১১ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। কলারোয়ায় হিন্দু বাড়ির খড়ের স্তূপে আগুন জামায়াত-শিবিরের (১১জানুয়ারি, ২০১৪ সংবাদ)। মোড়েলগঞ্জে মন্দিরে আগুন, আটক ৩ (১১ জানুয়ারি, ২০১৪ সংবাদ)। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চলছেই (১১ জানুয়ারি, ২০১৪ সংবাদ)। মনিরামপুরে সংখ্যালঘু দুই নারীকে অকথ্য নির্যাতন (১১ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক ইত্তেফাক)। বাড়িঘরে ফিরতে শুরু করেছে ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুরা (১১ জানুয়ারি, ২০১৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। (নির্যাতন সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ সংবাদ শিরোনাম যুক্ত হলে এই লেখার পরিসর অনেকটাই দীর্ঘ হবে বিধায় বাদ দেওয়া হলো)।

সর্বশেষ ২০১৬ সালের মার্চে সারাদেশে দলীয় রাজনৈতিক ব্যানারে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন কালে আবার হামলার শিকার হয় সংখ্যালঘুরা। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে ব্যাপক হারে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় সংঘটিত হামলার ঘটনার যে কয়টির সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তার ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়ায় কমপক্ষে ৮,২৫০। প্রকৃতপক্ষে ঘটনার সংখ্যা আরও অনেক বেশি। সেই হিসেবে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যাও অনুমেয়। অন্যান্য সময়ে নির্বাচনে শুধুমাত্র যে কোনো সুনির্দিষ্ট একটি দলই এই অত্যাচার নির্যাতনের সাথে অধিক সংখ্যায় জড়িত ছিল। কিন্তু এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলমত নির্বিশেষে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। এ ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে আওয়ামী লীগের প্রার্থী, আওয়ামী লীগের বিরোধী প্রার্থী, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী, বিএনপি, জামায়াত ও অন্যান্য প্রার্থী এবং তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ইতঃপূর্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে হারলে কিংবা জিতলে উভয় ক্ষেত্রেই নৌকা প্রতীকে সমর্থনের অভিযোগে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এবারের নির্বাচনে অত্যাচার নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘুরা কেউ প্রার্থী, কেউ সমর্থক, কেউ নৌকা প্রতীকের, কেউ নৌকার বিরোধীতাকারী, কেউ স্বতন্ত্র, কেউ বিজয়ী, কেউবা পরাজিত। মূল কথা তারা সংখ্যালঘু, তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি কিংবা কারণের প্রয়োজন নেই। সংখ্যালঘু হলেই নির্যাতন চলবে, ফলস্বরূপ তারা দেশত্যাগও করবে- এটাই এখন স্বাভাবিক এবং সাধারণ বিষয়।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে হিন্দুদের এই রূপ দেশত্যাগ কেন থামছে না? স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হিন্দু নিধনের যে মিশন বাস্তবায়িত হয়েছিল তার ফলে শরণার্থী জীবন বেছে নিয়েছিল প্রায় ১ কোটি হিন্দু। স্বাধীনতার পর তারা আবার ফিরেও এসেছিল। ১৯৭১ সালে যে আঘাত এসেছিল এদেশের হিন্দুদের উপর অনুরূপ আঘাত আজও অব্যাহত রয়েছে। দেশ স্বাধীন হলেও স্বাধীনতা বিরোধীরা এদেশে তৎপর রয়েছে। তারা বরাবরই হিন্দুদের উপর তাদের অত্যাচার নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। তাদের এই অত্যাচারের পিছনে একটি বড়ো কারণ সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। বাংলাদেশের হিন্দুদের দেশত্যাগের নেপথ্যে আরও যে কারণগুলো ক্রিয়াশীল তা হলো– ১. নিরাপত্তাহীনতা, ২. সম্পত্তি বেদখল, ৩. ধর্মীয় উপাসনালয়ের উপর আঘাত, প্রতিমা ভাঙচুর, পূজা-পার্বণে বাধাদান, ৪. নিজস্ব সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু ও নেতিবাচক পারিপার্শ্বিকতা ৫. আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, ৬. পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে মেয়েদের চরম নিরাপত্তাহীনতা, ৭. হিন্দু নারীদের ধর্ষণ, অপহরণ, উত্যক্তকরণ ৮. পারিবারিক অসচ্ছলতা (নদীভাঙন ইত্যাদি ক্ষেত্রে), ৯. ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাদের দৌরাত্ম ও হুমকি, ১০. খুন, ১১. গুম/অপহরণ ১২. নির্যাতন ও নিপীড়ন ইত্যাদি কারণগুলোও কমবেশি দায়ী। উপরোক্ত কারণের সাথে অন্যতম একটি কারণ যুক্ত হয়েছে তা হলো নির্বাচনকালীন সহিংসতা। নিরাপত্তার বিষয়টি এখানে সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল। ভয়ভীতি প্রদর্শন, হুমকি, খুন, ধর্ষণ, গুম ইত্যাদির মাধ্যমে আতংক সৃষ্টি করা হলে তারা বাপদাদার ভিটেমাটি ছেড়ে শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর স্বার্থে দেশত্যাগে বাধ্য হয়। দেশত্যাগের এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় গোপনে এবং নিরবে। তাই মিডিয়াতে এসব খবর আসে না। হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু প্রতিরোধ হচ্ছেনা। এক তরফা মার খেয়ে নির্যাতিত হতে হতে একসময় ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সংখ্যালঘুদের পাশে কেউ দাঁড়াচ্ছে না, তাদেরকে কেউ আশ্বস্ত করছে না। তারা যাতে নির্বিঘ্নে সম্পত্তি বিক্রি করতে পারে বড়জোর এতটুকু সহযোগিতা করছেন কোনো কোনো শুভাকাঙ্খী। তারা দয়া করে তার প্রতিবেশীর দেশত্যাগের পথকে নির্বিঘ্ন করছেন।

সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জরুরি তাগিদ রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল এমনটি কখনও দেখা যায় নি। এটাকে সুযোগ হিসেবে নিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা। নির্বাচন ইস্যু, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পরস্পরবিরোধী সংঘাত, সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ- সবকিছুর ঢেউ শেষে গিয়ে আছড়ে পড়ে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর-সম্পত্তির ওপর। এ যেন এদেশে বসবাসরত সংখ্যালঘুদের

পৃষ্ঠা ৬

হাসপাতালের শয্যায় নির্যাতিত সংখ্যালঘু মহিলা ছবি : পরিষদ বার্তা

বিচারের বাণী নিরবে-নিভৃতে কাঁদছে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ভয়ভীতি দেখিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করা হয়েছে এক হিন্দু নারীকে। এক পর্যায়ে অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টায় বাধা দিতে গেলে কুপিয়ে গুরুর জখম করা হয় ধর্ষণের শিকার ওই নারীকে। তারপরও থানা ধর্ষণের মামলা নেয়নি, নিয়েছে জখমের মামলা। পরে জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালতে মামলা করেন তিনি। সংখ্যালঘু ওই নারীর অভিযোগ, তিনি মামলায় সাক্ষ্য দিতে ভাড়ায়চালিত মোটরসাইকেলে মোল্লাহাট থেকে বাগেরহাট জেলা সদরে যাওয়ার পথে ট্রাকচাপা দিয়ে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টাও করা হয়।

গুরুতর আহত ওই নারী পঙ্গু হাসপাতাল নামে পরিচিত রাজধানীর জাতীয় অর্থোপেডিক পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ধর্ষক এতই শক্তিশালী যে, তার ভয়ে দরিদ্র সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ধর্ষণের শিকার নারীর স্বামী তাদের কলেজপড়ুয়া মেয়েসহ হাসপাতালেই আছেন। ছেলেকে রাখা হয়েছে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। আতঙ্কে আছেন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কোথায় যাবেন।

বাগেরহাটের মোলাহাট উপজেলার চুনখোলা ইউনিয়নের দরিদ্র সংখ্যালঘু পরিবারের ওই নারী ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেন, প্রতিবেশী সোবহান মোল্লা গত বছরের শুরুর দিকে ভয়ভীতি দেখিয়ে প্রথমবারের মতো তাকে ধর্ষণ করেন। পরে তার ছেলেমেয়েদের মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে বারবার ধর্ষণ চালিয়ে যান। সকালে ছেলেমেয়ে স্কুলে এবং দিনমজুর স্বামী কাজের সন্ধানে বাইরে বের হওয়ার পরপরই সোবহান মোল্লা ধারালো ছুরি ও দা নিয়ে তার ঘরে হাজির হতেন। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাকে শারীরিক মিলনে বাধ্য করতেন। কিছুদিন চেপে রাখার পর বিষয়টি স্বামীকে জানান তিনি। স্বামী ওই ঘটনা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি,ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং চেয়ারম্যানকে জানান। কিন্তু ঘটনার প্রতিকারে কেউ এগিয়ে আসেনি।

সরেজমিন মোলাহাটের ওই গ্রামে গিয়ে জানা যায়, সোবহান মোল্লা নিজে সরকারদলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এবং তার নিকটাত্মীয় ছবেদ আলী মোল্লা স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি। চুনখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তানজিল মুন্সীও ওই সোবহান মোল্লাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। ফলে উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরের প্রত্যন্ত গ্রামটিতে মুখ খোলার সাহস নেই কারোরই। অবশ্য চুনখোলা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. মিরাজ শরীফ জানান, সোবহান মোল্লা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দীর্ঘদিন ওই নারীকে ধর্ষণ করেছেন। এ ঘটনার বিচার হওয়া উচিত। চুনখোলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মনোরঞ্জন পাল বলেন, তিনিও এলাকাবাসীর কাছ থেকে ঘটনাটি শুনেছেন।

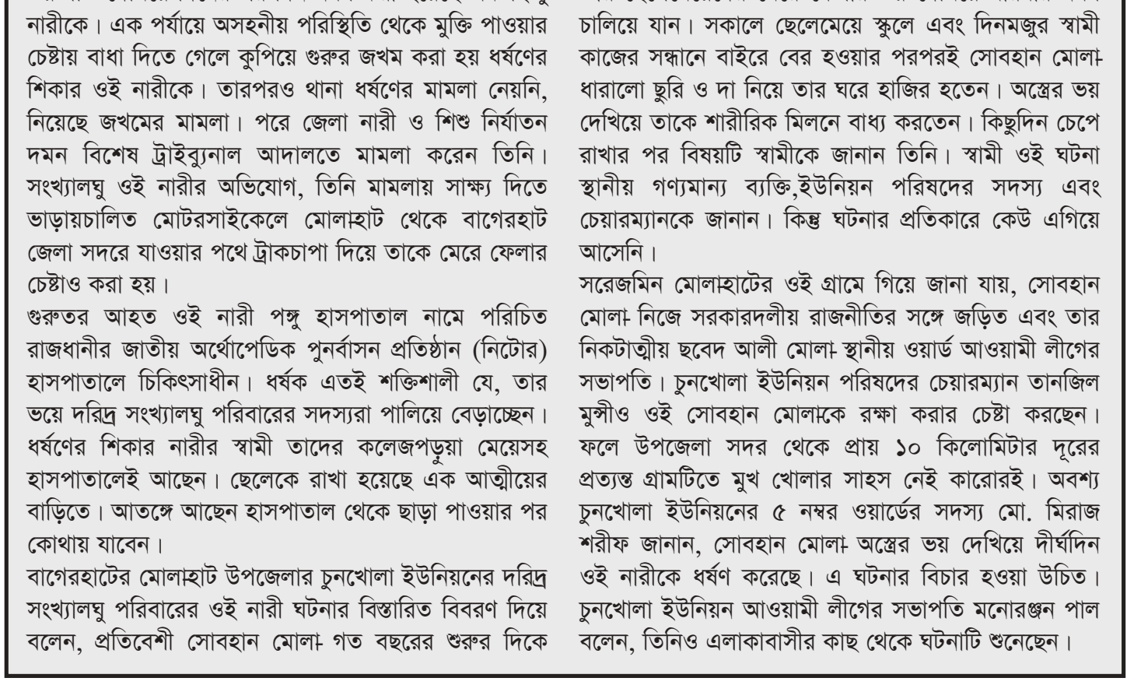

জয়পুরহাটের কালাইয়ে লীলাকীর্তন অনুষ্ঠানে হামলার পর ছবি : পরিষদ বার্তা

লীলাকীর্তন অনুষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

সম্প্রদায়ের লোকজন অনুষ্ঠান ছেড়ে বাড়ির বাইরে এসে অবস্থান নিলে সুযোগ বুঝে দুর্বৃত্তরা পিছন দিক থেকে ওই বাড়িতে প্রবেশ করে প্যান্ডেলের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং চেয়ার-টেবিল ভাংচুর করে। পরে ভোগের প্রসাদ ফেলে দিয়ে একটি খড়ের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারা পালিয়ে যায়।

বাড়ির মালিক খগেন চন্দ্র মালী বলেন, অনুষ্ঠান বন্ধ করতে দুর্বৃত্তরা শুরু থেকে আমাদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে আসছেন। ঐ রাতে তারা বাড়িতে প্রবেশ করে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও প্রসাদ নষ্ট করেছে। ওই বিষয়ে পুলিশ ও চেয়ারম্যানকে জানানো হয়েছে। এখন আমাদের নিরাপত্তার প্রয়োজন।

প্রতিবেশী স্বপন, প্রভাস ও সুশীলা জানান, তারা যখন বাবা লোকনাথের ছবি নিয়ে গীতাপাঠ করছিলেন, ঠিক তখনই দুর্বৃত্তরা ইট-পাটকেল ছুড়ছিল। ভয়ে তারা অন্য জায়গায় অবস্থান নিলে দুর্বৃত্তরা পিছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে পালিয়ে যান।

অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের বিষয় নিশ্চিত করে কালাই থানার ওসি তদন্ত ছাইদুর রহমান বলেন, রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্যামল কান্তি ভক্তকে গ্রেফতার ষড়যন্ত্রমূলক

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

অধ্যক্ষ সমর সিংহ রায় প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, শিক্ষক শ্যামল ভক্তকে গত বছর ধর্ম অবমাননার বানোয়াট অভিযোগ এনে স্থানীয় সাংসদ সবার সামনে কান ধরে ওঠবস করিয়েছিলেন। পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে, শ্যামল ভক্তের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁকে স্কুল থেকে উৎখাত করতেই এই অভিযোগ আনা হয়। এবারেও সেখানে ঘুষের অভিযোগ আনা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, দেশ থেকে শ্যামল ভক্তকে বিতাড়িত করতে তাঁকে গ্রেপ্তারের আগে ৫০ লাখ টাকা দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু তিনি ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেছেন, মাতৃভূমি ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। ক্ষমতাশালীরা তাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সন্ত্রস্ত ও দেশত্যাগে বাধ্য করতে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সারাদেশে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ এনে হামলা ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে, মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ভাংচুর করা হচ্ছে, জায়গাজমি জবরদখল করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

নির্বাচনকালীন সহিংসতা ও অন্যান্য অনুসঙ্গ

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

অপরিহার্য নিয়তি। এদেশে তো পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনী, সরকার, লেখক, বুদ্ধিজীবী- সবই আছে, এতকিছু থাকার পরও কেন প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না এসব অশুভ চক্রকে। যারা সংখ্যালঘুদের আক্রমণ করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে তাদের বাড়িঘর, তাদের বসবাসও তো এই সমাজেই। তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা কেন তবে এতো কঠিন হয়ে পড়ছে দিন দিন। এদেশের সংখ্যালঘুরা এভাবে নির্যাতিত হয়ে দেশত্যাগ করবে আর আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে– আমাদের স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও অঙ্গীকার অন্তত তা সমর্থন করে না। পৃথিবীর সবখানে লোক বাড়ে, কিন্তু বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রম। হিন্দুরা এখানে কমছে। স্বাধীনতার আগের দুটি ও পরের পাঁচটি শুমারির তথ্য বিশেষণ করলে দেখা যায়, মোট জনসংখ্যার তুলনায় হিন্দুদের সংখ্যা ও হার কমেছে। বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর হার মোটামুটি একই ছিল বা আছে।

আদমশুমারির তথ্যে দেখা যায় বাংলাদেশে ১৯৫১ সালে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল ২২.০ ভাগ। এরপর ১৯৬১ সালে ১৮.৫ ভাগ, ১৯৭৪ সালে ১৩.৫ ভাগ, ১৯৮১ সালে ১২.১ ভাগ, ১৯৯১ সালে ১০.৫ ভাগ এবং ২০০১ সালে ৯.২ ভাগ হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল। বর্তমানে আছে মাত্র ৮.৫ ভাগ। ইতিহাসের এই দীর্ঘ নেতিবাচক মানবিক বিপন্নতা কোনো সুস্থ মানবতাবাদী সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। চলমান ঐতিহাসিক এসব অমানবিক অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে দেশের মানবতাবাদী চৈতন্য সদা-জাগ্রত থেকে এদেশের সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসবে এমনটাই প্রত্যাশা।

প্রিয়া সাহা : সাধারণ সম্পাদক, মহিলা ঐক্য পরিষদ

চট্টগ্রামে শিব মন্দিরে ভাঙচুর

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়।

সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান, মন্দির চত্বরে মূর্তির ভাঙা কিছু অংশ পড়ে আছে। তাতে আগুন দেওয়া হয়। তখনও ধোঁয়া উঠছে। প্রায় সাত ফুট লম্বা কালো ভৈরবের মূর্তি পুকুরের পাশে উপড়ে পড়ে আছে। মন্দিরের বারান্দায় স্থাপিত নন্দীকেশরের মূর্তির মুখের অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। মন্দিরের দেয়ালে টাইলসে অঙ্কিত কালী দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ ও সারদা দেবীর চিত্রে কালো স্কচটেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়। নন্দীকেশরের মূর্তিটি বসানোর স্থানে 'ওঁ' লেখাও কালো টেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। অজিত শীল বলেন, রাত ১০টায় মন্দিরে তালা দিয়ে বের হয়ে যাই। রোববার সকালে এসে দেখি এ বীভৎস দৃশ্য। তিনি বলেন, 'কে করেছে জানি না।' এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে একটি মামলা করেছেন। মন্দিরের পাশের বাসিন্দা পম্পি শীল বলেন, রাত ২টার দিকে ঘুমাতে গেছি। তখনও সব ঠিক ছিল। মন্দিরের সব বাতি জ্বলতে দেখেছি। সকালে উঠে দেখি এ অবস্থা। আশপাশে বিভিন্ন ভবনের নির্মাণকাজের শব্দের জন্য বিষয়টি রাতে কেউ টের পায়নি। এক মাদকাসক্ত যুবক ঘটনার দায় স্বীকার করলেও ভক্তরা তা বিশ্বাস করছে না। তাদের ধারণা দুর্বৃত্তরাই ঘটনা অন্যদিকে নিয়ে যেতে তাকে পাঠিয়েছে। বন্দর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) বিকাশ সরকার বলেন, 'শুক্কুর নামে এক যুবক এসে বলছে তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে একাই মূর্তিগুলো ভাংচুর করেছে। মহাপুরুষদের চিত্রের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিল। তারা কথা বলেনি, তাই টেপ লাগিয়ে দিয়েছে। টেপ মন্দিরের সামনে পেয়েছে বলে দাবি করেছে।

'বাড়িঘর ছাইরা ভারতে চইলা যামু কইছি, তবুও...'

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

দখল করেছে প্রতিবেশী প্রভাবশালী আবুল হোসেন। শুধু তাই নয়, সেই ভিটা দখল করে ঘর তোলা হচ্ছে। স্বামীর রেখে যাওয়া ভিটা রক্ষায় যখন কানন বালা এগিয়ে গেলেন তখন তাঁর হাত-পা বেঁধে নির্যাতন করা হলো। শুরুতেই কিল-ঘুষি, পরে দখলদাররা কানন বালাকে মাটিতে ফেলে লাথি এবং পদদলিত করে নির্যাতন চালায়। পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার আলীপুর ইউনিয়নের পূর্ব আলীপুর গ্রামে এই নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে কানন বালাকে উদ্ধার করে দশমিনা স্বাস্থ্য কমপেক্সে ভর্তি করে। তবে পথে সন্ত্রাসীরা মোটরসাইকেলে মহড়া দিয়ে চিকিৎসা দিতে বাধা দেয়। অবশেষে ভয়ে ছেলে অসীম চন্দ্র দাস তাঁর মা কানন বালাকে পটুয়াখালী ২৫০ শয্যার হাসপাতালে ভর্তি করান। এ ঘটনায় ১১ মে দশমিনা থানায় ১৪ জনের নাম উলেখ করে একটি মামলা দায়ের করেছেন। স্থানীয়রা বলছে, নির্যাতনকারীরা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সভাসমাবেশে সামনের সারিতেই থাকে।

কানন বালার ছেলে অসীম জানান, সরকারের কাছ থেকে তাঁরা ৬০ শতাংশ জমি বন্দোবস্ত নেন এবং নিজেদের রেকর্ডীয় সম্পত্তি ১৯ শতাংশ। এই সম্পত্তিতে তাঁদের বসতঘর, পুকুর ও গাছপালা রয়েছে। এই সম্পত্তির ওপর দৃষ্টি পড়ে স্থানীয় আবুল হোসেনসহ আশপাশের লোকজনের। দীর্ঘদিন ধরে ওই সম্পত্তি দখলের জন্য নানাভাবে ভয়ভীতি দেখানো হয় তাঁদের। এমনকি সম্পত্তি না দিলে দেশছাড়া করা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়। ঘটনার সময় তিনি ও তাঁর স্ত্রী বাসায় ছিলেন না। শুনেছেন আবুল হোসেন ও তার আত্মীয়রা তাঁর মাকে মেরে বিবস্ত্র অবস্থায় হাত-পা বেঁধে রেখেছিল। পুলিশ এসে তাঁর মাকে উদ্ধার করে। আবুল হোসেন বিএনপি'র নেতা ছিলেন, এখন আওয়ামী লীগ করেন।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কানন বালা বলেন, 'আমার ছেলে অসীম ও ছেলের বৌসহ মাধবী লানী দশমিনা উপজেলার একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে মাস্টাররোলে নৈশ প্রহরী ও ঝাড়ুদারের কাজ করে। ঘটনার দিন বাড়িতে কেউ ছিল না। ঐদিন সকাল আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে আবুল হোসেন ও তার ভাই বারেক প্যাদা লোকজন নিয়ে এসে বাড়ির গাছ কেটে ফেলতে থাকে। একপর্যায়ে লোকজন দিয়ে ঘর নির্মাণ শুরু করে। এ সময় বাধা দিলে দখলদাররা আমাকে ধাক্কা দিয়ে কিল-ঘুষি মারতে থাকে। একপর্যায়ে মাটিতে পড়ে গেলে রশি দিয়ে পা দুটো এবং ওড়না দিয়ে হাত বেঁধে ফেলে। এরপর চলে অমানবিক নির্যাতন।'

পটুয়াখালী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কানন বালা কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাংবাদিকদের আরো বলেন, 'ওগো কাছে কতবার পাও ধইরা মাফ চাইছি। বাড়িঘর ছাইরা ভারতে চইলা যামু কইছি, তবুও অরা আমারে পাড়াইয়া মাটিতে ফালাইয়া রাখে। প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য একটু আড়ালে যাইতে চাইলেও দখলদাররা মোরে বাইরে যেতে দে নাই। এইভাবে নির্যাতন চলতে থাকে।'

গাইবান্ধায় ১২ জেলে পরিবার উচ্ছেদ

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

৩ মে গাইবান্ধা প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে অসহায় পরিবারগুলো তাদের বাড়িঘর ফেরতসহ ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে। মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন রফিকুল ইসলাম, বিনতি রাণী, বাসনা রাণী প্রমুখ। লোমহর্ষক সেই ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার সময় শিশু ও মহিলারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। কেউ কেউ রাস্তায় শুয়েও পড়েন। তাদের অভিযোগ, এমদাদুল হক সাড়ে ৯ বিঘা জমি নিজের দাবি করে ভাড়া করা সন্ত্রাসীদের নিয়ে ২ মে দুপুরে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ওই গ্রামে হামলা চালিয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে। এসময় সন্ত্রাসীরা তাদের বাড়িঘরে ভাংচুর চালায়, গৃহস্থালী জিনিসপত্র আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তারা সেখানে একটি মন্দিরও ভাংচুর করে। এছাড়া সন্ত্রাসীরা পালানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং চারপাশে তাঁরকাটা দিয়ে ঘিরে রাখে। সন্ত্রাসীদের মারপিটে শিশু মহিলাসহ ৮ জন আহত হয়।

জয়পুরহাটে বারো শিব মন্দিরে হামলা

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

মন্দিরে '৭১ সালেও কেউ হাত দেওয়ার সাহস করেনি। অথচ শুক্রবার রাতে এ মন্দিরে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হলো। তারা বলেন, শিবলিঙ্গ নতুন করে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মন্দিরে পূজা অর্চনা অনুষ্ঠিত হবে না। তারা বলেন, ১২টি মন্দিরে স্থাপিত ১২টি শিবলিঙ্গের এমন দর্শনীয় মন্দির দেশের কোথাও নেই। এমন নয়নাভিরাম মন্দির দেখার জন্য বহু পর্যটক এখানে আসেন। সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট সামছুল আলম দুদু, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোকাম্মেল হক, পুলিশ সুপার রাশিদুল হাসান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান রকেট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল
অনতিবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দা
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল ছবি : পরিষদ বার্তা

শ্যামল কান্তি ভক্তকে গ্রেফতার ষড়যন্ত্রমূলক

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গত ২৭ মে সারাদেশে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে। মানববন্ধন ও বিক্ষোভ থেকে সাত দিনের মধ্যে মামলা প্রত্যাহার করে শ্যামল কান্তি ভক্তকে নিঃশর্তে মুক্তি না দিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় ঐদিন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক। বক্তব্য রাখেন মিলন কান্তি দত্ত, জে এল ভৌমিক, পরিমল চন্দ্র গুহ, ডিএন চ্যাটার্জি, এ্যাডভোকেট তাপস কুমার পাল, নির্মল কুমার চ্যাটার্জি, এ্যাডভোকেট শ্যামল কুমার রায়, উত্তম কুমার চক্রবর্তী, ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, এ্যাডভোকেট কিশোর রঞ্জন মন্ডল, ব্রজগোপাল দেবনাথ,

পৃষ্ঠা ৬

অর্জন কম নয়, পর্যায়ক্রমে বাধা পেরিয়ে যেতে হবে

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীও এ ভাষায় সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরেছেন। অথচ এ কথাতো সত্যি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্যে বাঙালি ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করেনি, কিংবা মুসলিম রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' ভেঙ্গে আরেক মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্মের জন্যে ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ হয় নি। অর্থনীতিসহ অনেকক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন ঘটলেও, মাথাপিছু গড় আয় বাড়লেও ধর্মীয়-জাতিগত জনগোষ্ঠীর হার কেন কমছে, কেন তারা দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছে সে ব্যাপারে কারো কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

ইতিহাসের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চেয়েছিলাম। প্রতিষ্ঠিতও হয়েছিল। কিন্তু কেন আজ আবার ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের সংখ্যা কেন কমে যাচ্ছে এই প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে আমাদের। এটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। মেসবাহ কামাল আরও বলেন, ঐক্য পরিষদ যে লড়াই করছে সে লড়াই তো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব মানুষেরই হওয়ার কথা। কেন হয়নি? নিশ্চয়ই আমরা যা বলি তা বিশ্বাস করি না, যা মনে মনে বিশ্বাস করি তাই করি। ঐক্য পরিষদের লড়াইয়ের সঙ্গে তিনি সহমর্মিতা জানান।

এ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেন, অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে যারা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেছিল তারা আজ সরকারের অংশ। পঞ্চদশ সংশোধনীতে রাষ্ট্রধর্মের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ধারা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কি হবে? হেফাজত তো এখন মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী শক্তির সঙ্গে ঘাটছড়া বেঁধেছে। তারা রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণেও ভূমিকা রাখছে। তিনি বলেন, আজ আমরা এক ভয়ংকর দুঃসময় অতিক্রম করছি। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ না হলে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ থাকবে না।

অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেন, বর্তমান সরকারের সময় অনেক ইতিবাচক অর্জন আছে, কিন্তু শত্রু সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনসহ অনেক ক্ষেত্রে এখনো আকাঙ্খিত পর্যায়ে আমরা যেতে পারিনি। সরকারকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

[সাধারণ সম্পাদকের লিখিত বক্তব্য তৃতীয় পৃষ্ঠায়]

পটুয়াখালী

পটুয়াখালী প্রতিনিধি জানিয়েছেন, গত ২০ মে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ২৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জেলা ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টায় নতুন বাজার আখড়াবাড়ি থেকে র‍্যালীটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে লঞ্চ ঘাট চত্বরে এক সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। অতুল চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য এ্যাড. তারক চন্দ সাহা, জেলা ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার দাস, তপন কুমার কর্মকার, এ্যাড. উত্তম কর্মকার, কাজল দাস, রঞ্জন কর্মকার, মধুসূদন মন্ডল প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা তাদের বক্তব্যে জেলার দশমিনা উপজেলার বিধবা কানন বালার উপর বর্বরোচিত হামলার তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানান এবং হামলাকারীদের অবিলম্বে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান এবং কাননবালার বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবাজি মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

ধর্ম যার যার
রাষ্ট্র সবার
সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে
সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির ৭ দফা দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে
২৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র‍্যালী
তারিখ: ২০ মে ২০১৭ খ্রি., রোজ: শনিবার
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, পটুয়াখালী জেলা শাখা

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে পটুয়াখালীতে বর্ণাঢ্য মিছিল ছবি : পরিষদ বার্তা

'বাড়িঘর ছাইরা ভারতে চইলা যামু কইছি, তবুও...'

১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল কানন বালার। এখন তাঁর বয়স প্রায় ৫৫ বছর। স্বামী পরলোকগত হয়েছেন সেই কবে। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে চার মেয়ে ও এক ছেলেকে মানুষ করেছেন। চার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেও বিয়ে করেছে। কানন বালা তাঁর স্বামীকে যে ভিটায় দাহ করেছিলেন সেই ভিটাখানি এখন

পৃষ্ঠা ৭

জয়পুরহাটে বারো শিব মন্দিরে হামলা, অগ্নিসংযোগ

॥ জয়পুরহাট থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

দেশের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় পীঠস্থান জয়পুরহাটের বেলআমলার বারো শিবালয় মন্দিরে ২৬ মে শুক্রবার রাতে দুর্বৃত্তরা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। দুর্বৃত্তরা মন্দিরের ১৩টি শিবলিঙ্গে ব্যাপক ভাংচুর করে। কোনো কোনো শিবলিঙ্গে দাহ্য পদার্থ ঢেলে অগ্নিসংযোগ করা হয়। তারা মূল মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত দেবতা মহাদেবের বাহন ষাঁড়ের মূর্তিটিও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ ছাড়া তুলসী বেদি, হনুমান মন্দির ও কালীমন্দিরেও হামলা হয়। এ ঘটনায় স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পরেছে।

মন্দিরের পুরোহিত সেতু মোহন্ত জানান, ২৭ মে শনিবার সকাল ৬টার দিকে এসে মূল মন্দিরের দুটি গেটেই অতিরিক্ত তালা ঝোলানো দেখেন। ভেতরে তাকিয়ে ভাংচুরের চিহ্ন দেখতে পান। মন্দির কর্তৃপক্ষ খবর দিলে পুলিশ এসে দুর্বৃত্তের লাগানো তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে ১৩টি শিবলিঙ্গ ভাংচুর এবং অগ্নিসংযোগের আলামত দেখতে পাওয়া যায়। এ ঘটনার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মন্দিরে ভিড় করে। অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এ ঘটনার প্রতিবাদে মন্দির প্রাঙ্গণে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ মে শহরের জিরো পয়েন্টে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অভিযোগ করা হয়, ২৬ মে ঢাকায় জুমার নামাজ শেষে হেফাজতের সমাবেশ থেকে দেশে মূর্তি রাখা হবে না এমন ঘোষণার পর রাতেই এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রমাণ হয়, হামলার পেছনে হেফাজতের ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এ্যাড. নৃপেন্দ্র নাথ মন্ডলও ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে একই অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, হেফাজতের হুমকির পরই এই মন্দিরে হামলা হয়েছে। স্থানীয় হিন্দু নেতারা বলেন, ৫০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এ

পৃষ্ঠা ৭

অভিযোগ, হেফাজতের হুমকির পরই হামলা হয়েছে

গাইবান্ধায় ১২ জেলে পরিবার উচ্ছেদ

॥ গাইবান্ধা থেকে বার্তা পরিবেশক ॥

গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার ধাপেরহাট ইউনিয়নের পালানপাড়া গ্রামে সংখ্যালঘু ১২টি জেলে পরিবারের উপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। বাড়ি থেকে বিতাড়িত জেলে পরিবারগুলো খোলা আকাশের নিচে দীর্ঘ সময় বসবাস করে, থাকো অনাহারে। অভিযোগে জানা যায়, ওই গ্রামের মৃত নছিম উদ্দিনের ছেলে স্বেচ্ছাসেবক লীগের স্থানীয় নেতা এমদাদুল হকের নেতৃত্বে একদল ভাড়াটে সন্ত্রাসী ওই অসহায় পরিবারগুলোর উপর তান্ডব চালিয়ে তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে।

পৃষ্ঠা ৭

চট্টগ্রামে শিব মন্দিরে মূর্তি ভাঙচুর

॥ চট্টগ্রাম থেকে প্রতিনিধি ॥

চট্টগ্রাম মহানগরের গোসাইলডাঙ্গা এলাকায় গড় ১৩ মে গভীর রাতে একটি শিব মন্দিরে দু'টি প্রতিমা ভেঙে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। এই ঘটনায় বন্দর থানায় মামলা হয়েছে। হামলায় জড়িত অভিযোগে আবদুর শক্কুর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দা অজিত শীল জানান, রাত ১০টার দিকে মন্দিরে মূল দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সকালে এসে দেখি মন্দিরের বারান্দায় রাখা 'কালভৈরব' ও 'নন্দীকেশরের' মূর্তি ভাঙা। মন্দিরের সীমানা দেয়ালে অংকিত কালী, রামকৃষ্ণ, সারদা দেবীর চিত্রে কালো টেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে ঘটনাটি বন্দর থানায় অবহিত করা হলে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ ব্যাপারে বন্দর থানায় মামলা করা হয়েছে। এদিকে শিব মন্দির ভাঙচুরের ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা সকালে নগরীর বারিক বিল্ডিং মোড়ে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ এসে তাদেরকে

পৃষ্ঠা ৬

গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার ধাপেরহাট ইউনিয়নের পালানপাড়া গ্রামে সন্ত্রাসী হামলার শিকার ও উচ্ছেদ হওয়া জেলে পরিবারগুলো গাইবান্ধা প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে প্রতিবাদ জানায় ছবি : পরিষদ বার্তা

লীলাকীর্তন অনুষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর

॥ জয়পুরহাট প্রতিনিধি ॥

জয়পুরহাটের কালাইয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাসব্যাপী ধর্মীয় লীলাকীর্তন অনুষ্ঠানের শুরু থেকে দুর্বৃত্তরা বিভিন্নভাবে তাদেরকে গীতাপাঠ করতে নিষেধ করার ঘটনার জের ধরে ৫ মে শুক্রবার রাতে মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা বাড়িতে ভাংচুরসহ খড়ের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। উপজেলার জিন্দারপুর ইউনিয়নের মাদারপুর হিন্দুপাড়াতে এ ঘটনা ঘটেছে। রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

জানা গেছে, বৈশাখ মাস উপলক্ষে উপজেলার মাদারপুর গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন প্রতিবেশী খগেন মালীর বাড়িতে মাসব্যাপী ধর্মীয় লীলাকীর্তন ও গীতাপাঠ করছিলেন। শুরুর দিন থেকে এলাকার একদল দুর্বৃত্ত ওই অনুষ্ঠান না করার জন্য বিভিন্নভাবে নিষেধ করে আসছেন। তাদের নিষেধ অমান্য করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ওই অনুষ্ঠান চালিয়ে যান। ঐদিন দিবাগত রাত ৯টার দিকে লীলাকীর্তন শেষে গীতাপাঠ শুরু হলে দুর্বৃত্তরা তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। তাদের ভয়ে হিন্দু

পৃষ্ঠা ৬

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় সম্পাদক : বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।